চরিত্র

ফাইল থেকে মুখ তুলে বাঁ দিকের টেবিলটার দিকে তাকালেন সূর্যকান্ত। এর আগেও ক'বার আড়চোখে ওদিকে তাকিয়েছেন, প্রতিবারই এই একইভাবে পেয়েছেন ওকে - ভ্রুকুঞ্চিত স্থির দৃষ্টি আটকে রয়েছে সামনের বিবর্ণ ফাঁকা দেয়ালে। টেবিলের উপর কাগজপত্রগুলো অগোছালোভাবে ছড়ানো। সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবার দায়িত্ব যার তার মন আপাতত অন্যত্র। অতীশকে এরকম অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত নন সূর্যকান্ত । বরং তার উৎসাহ ও তৎপরতায় তাক্ লাগতো অফিসের অন্যান্য কর্মীদের। তারও আগে অবশ্য মাঝে মাঝেই মনমরা হয়ে থাকতো সে, তবে আজকের মত এতটা নয়। তখন মনমরা হওয়ার সঙ্গত কারণও ছিল একটা; কিন্তু সে কারণটা তো চিরতরে উৎখাত করার ব্যবস্থা হচ্ছে অচিরেই।

ছ-সাত বছর হ'ল এ অফিসে ঢুকেছে অতীশ এল.ডি.সি. হিসেবে। হেডক্লার্ক সূর্যকান্তকে অধঃস্তন কর্মীরা বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান তো দেয়ই তাছাড়া একটা স্নেহপ্রীতির সম্পর্কও গড়ে ওঠে অনিবার্যভাবে। কারণ সূর্যকান্ত তাদের কাছ থেকে শুধু কাজ আদায় করেই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামান; যেমন এই মুহূর্তে অতীশের ব্যাপার নিয়ে মনে মনে যথেষ্ট বিচলিত হয়েছেন। তবে বাইরে সেটা প্রকাশ পেলো না। সঞ্জয়, গোপীনাথ ও শুভেন্দু যে অতীশের এই উদাসীনতা সম্বন্ধে তার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা করতে গিয়ে বিমুখ হয়ে নিজেদের টেবিলে ফিরে এলো সেটা ওঁর নজর এড়ায়নি।

আজ শনিবার। হাফ্ ডে।

অফিস ছুটির পর বেরুবার মুখে করিডরে অতীশের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ঘরোয়া গলায় বলেন, "তাড়া আছে নাকি?"

অতীশের অস্ফুট উত্তরটাকে নেতিবাচক ধরে নিয়ে বলেন, "চলো এক কাপ চা খাওয়া যাক। ছোটেলালের গায়ে-গতরে ঘুণ ধরে গেছে। ক্যান্টিন থেকে অফিস-ঘর অবধি পৌঁছতে পৌঁছতে চা আর চা থাকে না, ঠাণ্ডা শরবৎ হয়ে যায় ----।"

নিজের মনে বকে চলেন সূর্যকান্ত। রাস্তা পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে ছোট একটা চায়ের দোকানে ঢোকেন দু'জনে। বিকেলের দিকে ভিড় থাকে, এখন এই বেলা দেড়টার সময় একদম ফাঁকা। দোকানের মালিক চেয়ারে বসে দেশলাই কাঠি দিয়ে নিবিষ্ট মনে দাঁত খুঁটছে। সূর্যকান্ত তার দিকে চেয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল ফাঁক করে চার্চিলের বিখ্যাত বিজয় ইঙ্গিত করলেন।

দোকানের মালিক অমনি বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "ওরে ফটকে, দু'কাপ চা।"

অতীশের সামনের চেয়ারটায় বসে সূর্যকান্ত বললেন, "তাহলে সাতই ফেব্রুয়ারী দিন ঠিক হ'ল?"

অর্থাৎ অতীশের বিয়ের দিন।

এর পটভূমিকাটা পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে বলে রাখা ভাল। অতীশের বাবা ভূপেশবাবু একটা বেসরকারী স্কুলে চল্লিশ বছর শিক্ষকতার পর বছর দশেক আগে যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর সঞ্চয়ের খাতায় ছিল একটা বিরাট শূন্য। তবে সঞ্চয় না থাকুক দায়দায়িত্ব ছিল অনেক। সাতটি সন্তানের মধ্যে একমাত্র বড় ছেলে অতীশ বি.এ. পাশ করে সামান্য মাইনের একটা অস্থায়ী চাকরী করছে। অন্য ছেলেটি ক্লাশ এইটে পড়ে। বাকি পাঁচটি কন্যা-সন্তান। তাদের ক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর প্রশ্ন না উঠুক অন্তত উপযুক্ত পাত্র জুটিয়ে দেবার দায়িত্বকে নস্যাৎ করা যায় না। এই পরিস্থিতি যে শ্রীমান অতীশের বিয়ের ফুল ফোটার অনুকূল নয় এ তো সুস্পষ্ট। মানুষ বিচারশীল প্রাণী। কিন্তু শুধু বিচার বিবেচনা দিয়ে জীবনের চাহিদা মেটে না। জীবনের বসন্ত বিদায় নেবে নেবে করছে; অতীশের মনে হয় জীবনটা শুধু ধূ ধূ মরুভূমি ----।

বাবা ইতিমধ্যে বড়ছেলের মুখ থেকে তাঁর অসমাপ্ত ঐহিক

কর্তব্যগুলি পালনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে করতে দেহ রেখেছেন। সংসারের রণাঙ্গনে অনিচ্ছুক শহীদ অতীশ। তার আত্মত্যাগের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত আত্মীয়-পরিজনদের কারো এ বিষয়ে অতীশের ব্যক্তিগত মতামত এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানতে চাওয়ার কথা মনে হয়নি কোনদিন।

মনে হয়েছিল শুধু সূর্যকান্তের। তাই কথাবার্তার ফাঁকে একদিন একান্ত নিরীহ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন অতি সাধারণভাবে।

অতীশ তিক্ত কন্ঠে বলেছিল, "না সূর্যদা ! আমি বিয়ে করবো না।"

"কেন বলতো?"

"আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন। তাই আমার আর বিয়ে করা হ'ল না।"

কথাটা বলে ফেলেই আত্মসচেতন হয়ে পড়েছিল অতীশ। সূর্যকান্ত সহজভাবে আলোচনার প্রসঙ্গ পালটে তখনকার মত চাপা দিয়েছিলেন বিষয়টা। কিন্তু কথাটা ক্রমশ বিব্রত ব্যতিব্যস্ত করে তুললো তাঁকে।

এরপর একান্ত আদর্শ পুত্র অতীশ যে সাহস সঞ্চয় করে মুখ খুলে তার সংসারী হ'বার বাসনা মায়ের গোচর করেছে, সে কৃতিত্ব একা অতীশের নয়। মা'র চোখের জল, মামা-কাকাদের ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি, সবকিছু মুখ বুজে সয়েছে অতীশ কিন্তু পিছিয়ে আসেনি। তবে কন্যা নির্বাচনের ভার গুরুজনদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে - একেবারে অতখানি আঘাত হানতে প্রাণ চায়নি তার।

পরে অবশ্য মনে হয়েছিল ভুল করেছে সে। কারণ তাঁদের তৎপরতা দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত যে পাত্রী খোঁজার কাজ শেষ হওয়া অবধি পাত্রের বিয়ের বয়স থাকে কি না থাকে। তাঁদের স্তিমিত উৎসাহ বর্ধনের জন্য মাঝে মাঝে যে সব অস্ত্র ছাড়তে হয়েছে সেগুলো সূর্যদার কাছ থেকেই আমদানী।

গতবারে মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছে অতীশ - বাড়িতে নানা অসুবিধার জন্য ও এবার থেকে মেসে থাকবে মনস্থ করেছে। অবশ্য মাসে মাসে

নিজের মাইনে থেকে কিছু টাকা বাড়িতে দেবে সে। ছোট ভাইটা উপার্জন করছে এখন। তিনটে বোন পাত্রস্থ হওয়ায় বাড়িতে পুষ্যিও কমে গেছে। কাজেই অতীশের প্রস্তাবে সার্বজনীন নিন্দার্ভৎসনা সত্ত্বেও, ওর তরফেও যুক্তি আছে। এই ওষুধেই ফল ধরলো শেষে।

দানাপুরের কুমারী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। মেয়েটি পাটনায় বি.এ. পড়ছে। বয়সের পার্থক্য একটু বেশি, তবে যাঁদের আপত্তি করার কথা - অর্থাৎ পাত্রীপক্ষ - তাঁদের এ বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। আরও তিনটি মেয়ে তাঁদের ঘরে, কাজেই পাত্রের বয়স নিয়ে খুঁত খুঁত করার সৌখিনতা তাঁদের পোষায় না। বিশেষত এই বয়সের পার্থক্যের দরুনই দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা সুবিধা যখন পাচ্ছেন।

সাতই বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে। বিয়ের কেনাকাটা, নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো, পুরুত জোগাড় ইত্যাদি সব ঝক্কিই অতীশের। আত্মীয়স্বজনের কারোরই বিশেষ উৎসাহ নেই এই ব্যাপারে। তবুও দমেনি সে। কিন্তু কালকের ঘটনায় একেবারে ভেঙে পড়েছে অতীশ, চুপসে গেছে ছেঁদা বেলুনের মত। কাল অফিস ফেরৎ বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা শুনলো সে। মেজমামা ওই খবরটা দেবার জন্যেই সারা বিকেল ওর জন্যে হত্যে দিয়ে বসেছিলেন।

"খবরটা কি?"

"পাত্রীর চরিত্র খারাপ।"

মেজমামার এক বিশিষ্ট বন্ধু দানাপুরে থাকেন। ভদ্রলোক কি একটা কাজে পাটনায় গিয়েছিলেন। উনি স্বচক্ষে দেখেছেন মেয়েটি এক ছোকরার সঙ্গে রিক্সায় ঘনিষ্ঠভাবে বসে যাচ্ছে ----।"

টেবিলের নড়বড়ে পায়ার দিকে চোখ রেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো অতীশ।

সূর্যকান্ত জেরা করলেন, "ঘনিষ্ঠভাবে মানে? কাঁধে হাত রেখেছিল? কিংবা হাত ধরেছিল?"

অতীশ নির্জীব স্বরে বললো, "পাশাপাশি বসেছিল ----।"

সূর্যকান্তের গলায় অধৈর্যতা, "আরে তাতো বসবেই। রিক্সাতে পাশাপাশি না বসে অন্য কোনভাবে বসা যায় নাকি? হ্যাঁ আর একমাত্র

কোলে বসা যায়। তাহলেই কি তোমার মেজমামার বিশিষ্ট বন্ধু খুশি হতেন?"

অতীশ চোখ তুললো না।

সূর্যকান্ত বলে চললেন, "পাত্রীর ফটো দেখিয়েছিলে সেদিন। রোগাপাতলা নয়, বেশ ভরন্ত চেহারা। পাটনার রিক্সার সীটের সাইজও আমার জানা। ওর সঙ্গে যে ছিল সে লোকটি যদি মাঝারী গড়নেরও হয় তাহলেও রিক্সায় বসলে ঘনিষ্ঠ হয়ে ছাড়া বসার স্কোপ নেই। তাছাড়া যে ভদ্রলোক দেখেছেন তিনি তো বললে দানাপুরের লোক। মেয়েটির সে-রকম কোন বদনাম থাকলে উনি নিশ্চয় আগেই শুনতেন, এবং" - সূর্যকান্তের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো - "সে খবর উনি তোমাদের জানাতে ভুলতেন না।"

অতীশ গোঁজ হয়ে বসে রইলো। মামার ক্রুদ্ধ আস্ফালন ও মা'র কান্না এখনও যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। ---- বিয়েক্ষ্যাপা অতীশ যদি ওই নষ্ট চরিত্রাকে বিয়ে করে তাঁদের নিষ্কলঙ্ক বংশে পাপ ঢোকায় তবে তার সমস্ত দায়িত্ব তার একার। ওঁরা এ পাপের ভাগী হতে পারবেন না কোনমতেই। ও ঘাড় হেঁট করে শুনে গেছে শুধু, উত্তরে একটি কথাও বলেনি। কাল সারারাত অভুক্ত, অতন্দ্র অতীশ ভেবে কোন কূল-কিনারা পায়নি। কূল-কিনারা বোধহয় নেইও, নইলে এভাবে তীরে এসে তরী ডোবে কারো?

কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্কতার পর নড়েচড়ে বসলেন সূর্যকান্ত। হাত তুলে ইশারায় আরও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর অতীশের দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপটা তুলে চুমুক দিলেন।

নিঃশব্দে চা পানের পর অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, "তোমায় একটা গল্প শোনাই। আমারই জীবনের ঘটনা।

"তুমি বোধহয় জানো না যে এক সময় দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কেটেছে আমার। আই.এ. পাশ করার পর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমরা তখন ভাগলপুরে থাকি। বাবার এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের ইলেক্ট্রিক্যাল গুড্স্'এর দোকান ছিল ধানবাদে। আমাদের অবস্থার কথা শুনে উনি

বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন আমাকে ধানবাদে নিয়ে যাবেন। দোকানের কাজকর্মে একটু সাহায্য করবো ওঁকে। সেই সঙ্গে প্রাইভেটে বি.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'বো। কাজের চাপ খুব একটা থাকবে না আমার উপর, শুধু দোকানের অন্যান্য কর্মীদের উপর নজর রাখতে হ'বে। দু'একজন অসাধু কর্মচারীর জন্য নাকি যথেষ্ট লোকসান এবং দুর্নাম হয়ে গেছে দোকানটার।

"মাখনবাবুর সঙ্গে ধানবাদে গেলাম। দোকানে রেডিও, ইস্ত্রি, হিটার ইত্যাদি বিক্রীই শুধু হয় না, পুরনো জিনিসপত্র মেরামতেরও ব্যবস্থা আছে। মেরামতের কাজ খানিকটা শিখে নিলাম। মোট বছর তিনেক ছিলাম। বি.এ. পাশ করলাম মোটামুটি ভালভাবেই। ওখানে বসে নানা জায়গায় চাকরির দরখাস্ত ছাড়ছি। সেই সময়কার ঘটনা এটা।

"আমাদের পাড়ায় একটা মেয়েদের স্কুল ছিল। টিচাররা অধিকাংশই স্থানীয়, দু'তিনজন শুধু বাইরের। তারা স্কুলের লাগোয়া দু'খানা ঘরে থাকতো। তাদেরই একজন - লতিকা সরকার - ভাগলপুরের মেয়ে। ভাগলপুরে থাকতে দুর্গাপুজো এবং অন্যান্য ফাংশনে দেখেছি তাকে। তবে বিহারে বাঙালী মেয়েরাও তখন পর্দা মেনে চলতো। কাজেই আলাপ পরিচয় ছিল না।

"লতিকার বয়স তখন বেশী নয়। ওর বাবা পসারহীন উকিল। বাড়ীর অবস্থা আমাদেরই মত। চার মেয়ে, ছেলে নেই। লতিকা সবার বড়। আই.এ. পাশ করে বাড়িতে বসে ছিল বিয়ের আশায়। ইতিমধ্যে ধানবাদের চাকরিটা পেয়ে গেল। বিয়ের চেষ্টাও চলতে থাকলো অবশ্য। আলাপ পরিচয় না থাকলেও মুখচেনা ছিল। আমাদের দোকানে দু'একবার এসেছে অন্য একটি টিচারের সঙ্গে।

"একদিন দু'জনে একটা রেডিও নিয়ে এসে হাজির। রেডিওটা নাকি বাজছে না ক'দিন থেকে। পরদিন ভাল করে পরীক্ষা করে রেডিওতে কোন খুঁত বেরোলো না।

ওরা এলে সেই কথাই বললাম, 'আপনাদের রেডিও তো একদম ঠিক আছে। কোনও ডিফেক্ট নেই।'

'তাহলে বাজছে না কেন?'

'এই দেখুন বাজছে ----।' রেডিও অন করে সিলোন ধরলাম। হেমন্তকুমারের গান হচ্ছে, 'তেরে দ্বার খাড়া এক যোগি ----।'

ওরা দু'জনে অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, 'কি আশ্চর্য, বাড়িতে তো একদম বাজছিল না।'

রেডিওটা নিয়ে গেল কিন্তু খানিক পরেই ফিরে এলো আবার। ওদের ঘরে গিয়ে রেডিও নাকি আবার সত্যাগ্রহ করেছে।

বললাম, 'তার মানে ডিফেক্ট রেডিওতে নয়, প্লাগ পয়েন্টে।'

'কাউকে পাঠিয়ে দিন না প্লীজ, একটু দেখে আসুক ----।'

তখন হাত খালি ছিল না।

বললাম, 'বিকেলের দিকে যাবো।'

"সন্ধ্যাবেলা দোকান বন্ধ করার পর যন্ত্রপাতির ব্যাগ নিয়ে হাজির হ'লাম। শীতের সন্ধ্যা। স্কুল কম্পাউণ্ড ঘিরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। গেটের কাছে একটা লোক ঘুঁটের আগুনে লিট্টি সেঁকছে; আগুন পোয়ানো আর রান্না দু'টো কাজই চলছে একসঙ্গে। জিজ্ঞেস করতে সে হাত নেড়ে টিচারদের কোয়ার্টার বাতলে দিলো।

"স্কুল-বাড়ির পিছনে পাশাপাশি দু'টো ঘর। দরজা জানলা সব বন্ধ। জানলার পর্দা ও কাচ ভেদ করে আবছা আলোর আভাস। একটু সেল্‌ফ্ কনশাস্ হয়ে দরজার কড়া নাড়লাম। পর্দার ফাঁকে একটা মুখ উঁকি দিলো। তারপর দরজা খোলার আওয়াজ। লতিকা আড়ষ্টভাবে সরে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে পথ করে দিলো। ঘরে অন্য কেউ নেই। আমার ভারি অস্বস্তি লাগছিল। এই নির্জন রাতে অল্পবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে একা একটা ঘরে ----।

"এখন হয়তো রোমান্টিক শোনাচ্ছে, তখন কিন্তু মোটেও তা মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। রেডিওর সুইচ্ অন্ করে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই। টান মেরে প্লাগ খুলে প্লাগ পয়েন্টটা দেখলাম। যতদূর মনে

হ'ল গলদটা এখানেই।

টর্চ ও যন্ত্রপাতি বার করে বললাম 'মেন সুইচ কোথায়?'

'এই যে এদিকে।'

'মেন সুইচটা অফ করে দিন। আমি না বলা পর্যন্ত অন্ করবেন না।'

মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এলো ঘরে। ---- মিনিট দুয়েকও যায়নি বোধ হয়, দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হ'ল। প্রথমে আস্তে, তারপর প্রবল জোরে। আমি লাফ মেরে উঠে আলোর সুইচ টিপলাম। কিন্তু মেন সুইচ বন্ধ থাকায় আলো জ্বললো না।

"বাইরে জলদ্গম্ভীর পুরুষকন্ঠ শোনা গেল, 'লতিকা সরকার আছে নাকি?'

একটি মহিলা কন্ঠ, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু আলো নেই তো? এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে নাকি?'

আমি ততক্ষণে পরিস্থিতির অপ্রিয় দিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেছি।

অন্ধকারে লতিকার উদ্দেশে বললাম, 'আলো জ্বালুন! আরে আলোটা জ্বালুন না ছাই!

লতিকার কাতর কন্ঠ শুনলাম, 'সুইচটা খুঁজে পাচ্ছি না ----।'

টর্চ জ্বেলে মেন সুইচ অন্ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। বাইরে তখন তাৎপর্যপূর্ণ নিস্তব্ধতা। ফ্যাকাশে মুখে দরজা খুলে এক পাশে দাঁড়ালো লতিকা, পিছনে একটু দূরে আমি।

"একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি মাঝবয়সী মহিলা ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক অপ্রসন্ন গলায় বললেন, 'আমি হরিদাস রায়। ভাগলপুরের ফণীভূষণ দত্ত আমার ভগ্নিপতি হ'ন। ওঁর চিঠি পেয়েই এসেছি ----।'

ভদ্রমহিলা চশমার ফাঁক দিয়ে ভ্রুকুটিকুটিল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমায় দেখলেন। লতিকা সরকারের ফ্যাকাশে মুখ দেখে মায়া হলেও সেই মুহূর্তে নিজের অবস্থাটা আরও বেশী করুণাজনক মনে হ'ল আমার। আমার পৃষ্ঠপোষক মাখনবাবু, আমার বাবা-মা-ভাই-বোন এবং চেনা পরিচিত সকলের ছবি একসঙ্গে আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠলো। এই

অপরিচিত দম্পতির দৃষ্টির নীরব ভর্ৎসনা যেন ক্রমশ সেই মুখগুলিতে স্থানান্তরিত হ'তে লাগলো।

কোনরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'আমি যাচ্ছি।'

তারপর যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগে ভরে কেটে পড়লাম।

"এর কিছুদিন পর গিরিডিতে একটা চাকরি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এর মধ্যে লতিকার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সেই সন্ধ্যার কথা মনে হ'লে লজ্জা ও আতঙ্কে ভরে উঠতো মন যদিও আমার কি দোষ ভেবে পেতাম না কিছুতেই।

"দু'বছরে চাকরিতে কিছু উন্নতি হ'ল। তারপর বিয়ে করে সংসারী হ'লাম। একবার ছুটিতে ভাগলপুরে অবস্থানকালে কথাচ্ছলে মা'র কাছে লতিকার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম।

মা বললেন, লতিকা নষ্টচরিত্রা। শুনলাম ভাগলপুরের বাঙালীদের সবারই নাকি সেই মত।

চোখে মুখে আপাতকৌতূহল ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'সে কি?'

মা বললেন, 'লতিকা যে একেবারে গোল্লায় গেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফণীবাবু তাঁর শালার ছেলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ করেছিলেন। শালা, শালা-বৌ ধানবাদে লতিকার কোয়ার্টারে গিয়ে তাকে জঘন্য পরিস্থিতিতে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। স্বভাবতই সমস্ত ঘটনা সবিশদ চিঠিতে ভগ্নিপতিকে জানিয়েছিলেন শালা। সারা শহরে ঢি-ঢি পড়ে যায়। তদবধি সরকার পরিবারকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে সবাই।'

বলতে বলতে মা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে এলাম।

"আজ স্বীকার করতে বাধা নেই যে খুব কষ্ট হচ্ছিল লতিকার জন্যে। ওর প্রতি কোনদিন কোন দুর্বলতা ছিল না আমার। বরং ওর মোটামুটি ভাল ঘর-বর জুটলেই আমি খুশী হ'তাম। ও আকস্মিকভাবে দুর্ভাগ্যে জড়িয়ে পড়ায় নিজেকে অপরাধী মনে হ'চ্ছিল। কিন্তু কি-ই বা করার ছিল। সত্যি কথা প্রকাশ করলে প্রৌঢ় প্রাজ্ঞ সস্ত্রীক হরিদাস রায়ের জবানবন্দীর বিরুদ্ধে আমার কথা কে-ই বা বিশ্বাস করতো? সে সাহসও

আমার ছিল না। বরং লতিকা সরকারের কলঙ্কের মূলে আমার ভূমিকা যে কেউ জানে না, আমার নামটা যে ফাঁস হয়ে যায়নি সেটাই পরম সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছিল সেদিন।

"কিন্তু বিধির বিধানের উপর হাত নেই কারো। পাঁচ বছর সুখে ঘর সংসার করার পর বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল। মাত্র দু'দিনের জ্বরে আমার স্ত্রী মারা গেলেন। দু'টি অবোধ শিশুকে নিয়ে অগাধ জলে পড়লাম আমি। বাচ্চা দু'টো না থাকলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতাম।

"প্রথমে সেই রকমই প্ল্যান ছিল; আমার শাশুড়ি ওদের রেখেও ছিলেন কয়েক মাস। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, তুমি কম্‌লিকে ছাড়লে কি হয়, কম্‌লি তোমায় ছাড়বে না। সংসারের মায়া যত কাটাতে চাই সংসার তত দশহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

"যাই হোক কয়েকটা বছর কোনভাবে কাটলো। সেবার মেজদির দেওরের বিয়েতে বরযাত্রী গেছি। পাত্রী মজঃফরপুরের মেয়ে।

বিয়ের প্যাণ্ডেলে শাদা তাঁতের শাড়ি পরা একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে কনের দাদা বললেন, 'ইনি মিস্ সরকার, মঞ্জুর টিচার।'

তখনও চিনিনি।

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'লতিকাদি, আপনি তো ভাগলপুরের মেয়ে; চেনেন নাকি এঁকে?'

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। লতিকার মুখখানা মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

ও চেষ্টাকৃত নিস্পৃহ গলায় বললো, 'কই, মনে পড়ছে না তো! আপনার পুরো নামটা বলুন দিকি। ও, আচ্ছা, চৌধুরী বাড়ির ছেলে আপনি ----।'

"বরযাত্রীদের ফেরার ট্রেন পরদিন বিকেলে। সকালবেলা লতিকার স্কুলে গিয়ে হাজির হ'লাম। সারারাত জেগে যে কথাটা শতবার শতভাবে ভেবেছি সরাসরি বললাম ওকে। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো লতিকা।

তারপর বিষন্ন মুখে মাথা নাড়লো।

'তা হয় না সূর্যবাবু। আপনি মহানুভব, কিন্তু বিয়ের মত ব্যক্তিগত ব্যাপারে দয়া-দাক্ষিণ্যের স্থান নেই।'

'দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা তুলছেন কেন? যদি সে প্রশ্ন থাকেও, জানবেন এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা দাতার নয়, প্রার্থীর।'

এর পর নিজেকে সামলাতে পারলাম না আর। গত ক'বছর ধরে দুঃখের যত জ্বালা জমে ছিল মনের আকাশে, শ্রাবণের ধারার মত নেমে এলো তা। লতিকা চুপ করে শুনে গেল সব। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো শুধু।

তারপর প্রশ্ন করলো, 'আপনার ট্রেন কটায়?'

'বিকেল পাঁচটায়।'

'আমাকে ভাববার সময় দিন একটু ----।'

"দুপুরবেলা স্কুলের চাপরাশি একটা খাম দিয়ে গেল। কম্পিত হাতে খাম খুললাম। একখণ্ড শাদা কাগজ। তাতে শুধু লেখা আছে, 'আচ্ছা।' তলায় লতিকার নাম।

"দিন দশেক পরে আবার মজঃফরপুর অভিমুখে অভিযান। এবার বরকর্তা, বরযাত্রী ও খোদ বরকে নিয়ে মানুষ সর্বসাকুল্যে একটি - আমি নিজে। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হ'ল। ঐ স্কুলেরই ক'জন টিচারকে সাক্ষী রেখে ----।

"কত বছর আগেকার কথা এসব। আর কোনদিন পিছনের পানে দেখিনি আমরা - আমি এবং লতিকা।"

সূর্যকান্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, "ইস্, চারটে বাজতে চললো। বুলুটাকে আবার ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হ'বে। একদম ভুলে গেছিলাম ----।"

ব্রিফকেস হাতে তুলে নিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। অতীশ এতক্ষণ অভিভূত হয়ে ওঁর কথা শুনছিল। সূর্যকান্ত উঠে দাঁড়াতে সেও

উঠে পড়লো। তারপর ইতস্তত করে ওঁর সামনে এসে নত হয়ে প্রণাম করলো।

(উপসংহার)

বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন সূর্যকান্ত।

স্ত্রী শান্তিময়ী একটা খাম হাতে দরজার কাছে এসে বললেন, "এইমাত্র দিয়ে গেল পিওন।"

সূর্যকান্ত উৎফুল্ল কন্ঠে বললেন, "পড় তো দেখি কার বিয়ে।"

শান্তিময়ী খাম খুলে রঙীন কার্ডখানা পড়তে লাগলেন, "স্বর্গীয় ভূপেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অতীশের সহিত ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের (অধুনা দানাপুর নিবাসী) শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা ----।"

সূর্যকান্ত সাবানের ফেনা মাখানো সেফটি রেজার ধরা হাত শূন্যে আস্ফালন করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "থ্রি চিয়ার্স ফর সূর্যকান্ত চৌধুরী, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।"

শান্তিময়ী অবাক চোখে স্বামীর কীর্তি-কলাপ দেখছিলেন।

হেসে বললেন, "বাঃ, বেশ মজা তো ! বিয়ে হচ্ছে শ্রীমান অতীশ ও শ্রীমতী শর্মিষ্ঠার অথচ চিয়ার্সটা সূর্যকান্ত চৌধুরীর পাওনা হ'ল কিসে?"

সূর্যকান্ত গর্বের হাসি হেসে বললেন, "বুঝলে দেবী, সব এই শর্মার কেরামতি। তা না হ'লে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর শুধু প্রথমা কন্যা কেন, ভদ্রলোকের কোন কন্যারই কোনদিন বিয়ে হ'ত কিনা সন্দেহ।"

শান্তিময়ী দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, "ওমা, সে কি গো?"

সূর্যকান্ত ততক্ষণে পুনরায় দাড়ি কামানোয় মগ্ন হয়েছেন।

সংক্ষেপে বললেন, "হ্যাঁ।"

খানিক বাদে সেফ্‌টি রেজার কলের জলে ধুয়ে তাকে রেখে দিলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "অতীশটা একটা রামছাগল, বুঝলে। এই সূর্যদা ছিল বলে তরে গেল, নইলে সবাই মিলে জবাই করার তালে ছিল ওকে।"

শান্তিময়ী উৎসুক কন্ঠে বলেন, "একদিন নেমন্তন্ন করলে পারো ওদের।"

সূর্যকান্ত বলেন, "নেমন্তন্ন না করলেও অতীশ বউ নিয়ে নিশ্চয় আসবে আমাদের বাড়ি। তবু বলছো যখন একদিন নেমন্তন্ন করবো। ও এখন ছুটিতে আছে। আসছে মাসে জয়েন করবে। তবে ওরা এলে কয়েকটা কথা কিন্তু ভুলো না।"

"কি কথা?"

"এই ছোট-খাটো দু'চারটে কথা। যেমন ধরো ওকে বলেছি যে তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। বুলু আর পল্টু তোমার সৎ ছেলে-মেয়ে। তুমি আগে স্কুল টিচার ছিলে। তোমার নাম ছিল লতিকা সরকার ----,"

বলতে বলতে হো-হো করে হেসে উঠলেন সূর্যকান্ত তারপর স্ত্রীর হতভম্ভ মুখের দিকে চেয়ে হাসি থামিয়ে সদয় কন্ঠে বললেন, "দাঁড়াও সব বলবো তোমায়। তার আগে এক কাপ চা চাই।"